Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মহাসফলতা ও চুড়ান্ত ব্যার্থতা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছা:জান্নাতুল তামান্না

রোলঃ 23090120446

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মহাসফলতা ও চুড়ান্ত ব্যার্থতা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছা:জান্নাতুল তামান্না

রোলঃ 23090120446

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " মহাসফলতা ও চুড়ান্ত ব্যার্থতা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোছা:জান্নাতুল তামান্না, আইডিঃ 23090120446 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " মহাসফলতা ও চুড়ান্ত ব্যার্থতা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

মোছাঃ জান্নাতুল তামান্না

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

মোছা:জান্নাতুল তামান্না

আইডিঃ 23090120446

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভুমিকা 5

আল্লাহ ও তার রাসুলের উপর বিশ্বাস স্থাপন 6

ঈমান অর্থ সমর্পণ 7

দ্বীনের ইলম অর্জন সফলতার পথ দেখায় 9

কুরআন-সুন্নাহ্য ইলম হাসিল করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ 10

ইলমে দ্বীন অর্জনের ফযীলত 12

নামায প্রতিষ্ঠা 16

রোজা মুমিনের ঢালস্বরূপ: 16

রোযা ঢাল স্বরূপ 18

হজ্বে বায়তুল্লাহ-মুমিনের দীলের তামান্না 19

যাকাত আদায় 20

পরিশুদ্ধ হৃদয় সফলতার মানদণ্ড: 21

অন্তরের রোগ বৃদ্ধি পায় কিভাবে, কিভাবে মানুষ ব্যার্থতার দিকে ধাবিত হয়: 23

আল্লাহর নিকট ইসলাহের তাওফীক প্রার্থনা 23

নবীজীর আদর্শ ই একমাত্র মুক্তির পথ-একমাত্র সফলতার পথ: 27

সুন্নতকে পূরজ্জীবিত করা ও বিদআতকে ঘৃণা করা 28

ঈমান ও নির্ভরতা 29

দ্বীনের দাওয়াত পৌছানো-দাওয়াত ইলাল্লাহ 30

বিপদে ধৈর্য্য ধারণ 33

ধৈর্য ধারণকারীদের বিপদ থেকে উদ্ধারের ঘোষণা 35

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য কুরবান হওয়া: 35

কুরআনের আয়াতে আয়াতে সফলতা ও ব্যার্থতা: 36

সুন্নাতে ভরা জীবন: 37

উপসংহার: 37

ভুমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আলহামদুলিল্লাহ, মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদেরকে মায়ের চেয়েও বেশি ভালোবাসেন। তিনি আমাদের জন্য একটি প্রশান্তিময় জীবন ব্যবস্থা দান করেছেন 'ইসলাম'। যুগে যুগে অসংখ্য অগণিত নবী ও রাসুল পাঠিয়েছেন তার বান্দাদের পথ প্রদর্শনের জন্য। হযরত আদম আলাইহিস সাল্লাম থেকে শুরু করে সকল নবী ও রাসূল উম্মাতের শিক্ষক,উম্মাত কে সত্য পথ দেখানোর জন্য সকল নবীগণ তাদের জীবন অতিবাহিত করেছেন।পৃথিবীতে যে সকল বান্দাগণ মহান আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে, নবী ও রাসূলদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং তাদের নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করেছে তারাই মূলত সফলতা অর্জন করেছে আলহামদুলিল্লাহ। এবং যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণকে যুগে যুগে অবিশ্বাস করেছে তারাই অবিশ্বাসী, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি! আল্লাহ ও তাঁর নবীদেরকে অস্বীকার করে দুনিয়ার জীবনে আমদ ও ফুর্তিতে মেতে উঠে অশ্লীল ও বেহুদা জীবন যাপন চরম ব্যর্থতার নামান্তর! নাউজুবিল্লাহ, হে মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সকল প্রকার নাফরমানী থেকে হেফাজত আমিন।

পবিত্র আল কোরআনে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, আলিফ লাম মিম। এ সেই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই। পথপ্রদর্শনকারী পরহেজগারদের জন্য। যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামাজ প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যে রুজি দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে।

এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের উপর যা কিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের উপর যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে।
তারাই নিজেদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সুপথ প্রাপ্ত, আর তাড়াই যথার্থ সফলকাম।
(সূরা বাকারাহ:১-৫)

আল্লাহ ও তার রাসুলের উপর বিশ্বাস স্থাপন

সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হল ঈমান। ঈমানের বিপরীত কুফর। ঈমান সত্য, কুফর মিথ্যা। ঈমান আলো, কুফর অন্ধকার। ঈমান জীবন, কুফর মৃত্যু। ঈমান পূর্ণ কল্যাণ আর কুফর পূর্ণ অকল্যাণ। ঈমান সরল পথ, আর কুফর ভ্রষ্টতার রাস্তা।

ঈমান মুসলমানের কাছে প্রাণের চেয়েও প্রিয়। ঈমানদার সকল কষ্ট সহ্য করতে পারে, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পারে, কিন্তু ঈমান ছাড়তে পারে না। ঈমানই তার কাছে সবকিছু থেকে বড়। ঈমান শুধু মুখে কালেমা পড়ার নাম নয়, ইসলামকে তার সকল অপরিহার্য অনুষঙ্গসহ মনেপ্রাণে কবুল করার নাম। আর একারণে মুমিনকে হতে হবে সুদৃঢ়, সত্যবাদী ও সত্যনিষ্ঠ। মুমিন কখনো শৈথিল্যবাদী হতে পারে না। কুফরির সাথে যেমন তার সন্ধি হতে পারে না তেমনি মুরতাদ ও অমুসলিমদের সাথেও বন্ধুত্ব হতে পারে না।

তো ইসলামের সে পূর্ণ পরিচয় কী? তার অপরিহার্য দাবি ও অনুষঙ্গগুলোই বা কী? এরই সংক্ষিপ্ত আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

দ্বীন ও ঈমান সম্পর্কে বেপরোয়া লোকদের যেহেতু এইসব বিষয়ের জ্ঞান নেই, কিংবা জ্ঞান থাকলেও পরোয়া নেই তাই তাদের মতে, ঈমান-কুফরের সন্ধিও অসম্ভব কিছু নয়। (লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম)

কুরআন মজীদের ইরশাদ-

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

তারাই মুমিন যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে, পরে সন্দেহ পোষণ করে না এবং জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে তারাই সত্যনিষ্ঠ।-আলহুজুরাত ৪৯ : ১৫

হাদীস শরীফে আছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রবীআ গোত্রের প্রতিনিধিদলকে এক আল্লাহর উপর ঈমান আনার আদেশ করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন-

أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا : الله ورسوله أعلم، قال : شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس.

তোমরা কি জান ‘এক আল্লাহর উপর ঈমান’ কাকে বলে? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (এক আল্লাহর উপর ঈমান আনার অর্থ) এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই। মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। আর সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রমযানের

রোযা রাখা ও গণীমতের এক পঞ্চমাংশ প্রেরণ করা।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ৫৩, কিতাবুল ঈমান, আদাউল খুমুসি মিনাল ঈমান

হকের সাক্ষ্য দেওয়া মুমিনের পরিচয়। মুমিন কখনো সত্য গোপন করে না অর্থাৎ, সত্যকে জেনেও তা স্বীকার করা থেকে বিরত থাকে না। কখনো মিথ্যা ও অবাস্তব সাক্ষ্যও দেয় না। অসত্য ও অবাস্তবের সাক্ষ্য দেওয়া তো কাফির মুশরিকদের বৈশিষ্ট্য। মুমিন তো এমন সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করে।

ঈমান অর্থ সমর্পণ

ঈমান আনার অনিবার্য অর্থ, বান্দা নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করবে। তাঁর প্রতিটি আদেশ শিরোধার্য করবে। আল্লাহর প্রতি ঈমান আর আল্লার বিধানে আপত্তি একত্র হতে পারে না। রাসূলের প্রতি ঈমান আর তাঁর আদর্শের উপর আপত্তি, কুরআনের প্রতি ঈমান আর তার কোনো আয়াত বা বিধানের উপর আপত্তি কখনো একত্রিত হয় না।

মুমিনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সমর্পণ আর ইবলীস ও তার অনুসারীদের বৈশিষ্ট্য বিপরীত যুক্তি। এখন তো শুধু আপত্তি বা বিপরীত যুক্তিই নয়, রাসূল, কুরআন ও ইসলামের প্রতি প্রকাশ্য বিদ্রোহকারীকেও মুসলমান মনে করা হয়। কারো প্রতি ঈমান, অতপর তার বিরুদ্ধতা এ দুটো একত্র হওয়া অসম্ভব হলেও 'অসহায়' ইসলামের ব্যাপারে বর্তমানের 'বুদ্ধিজীবী'দের কাছে তা পুরাপুরিই সম্ভব। বুদ্ধিমান মানুষমাত্রই জানেন, ইসলাম বিহীন তথা সমর্পণ বিহীন ঈমানের কথা কল্পনাও করা যায় না। আর না তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে। এ তো ঈমানের সাথে সরাসরি বিদ্রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়।

قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ l قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ lلَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

যে নিজেকে নির্বোধ করেছে সে ব্যতীত ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ হতে আর কে বিমুখ হবে। পৃথিবীতে তাকে আমি মনোনীত করেছি; আর আখেরাতেও সে অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণগণের অন্যতম। * তার প্রতিপালক যখন তাকে বলেছিলেন, আত্মসমর্পণ কর, সে বলেছিল, জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম। *এবং ইবরাহীম ও ইয়াকুব এই সম্বন্ধে তাদের পুত্রগণকে নির্দেশ দিয়ে বলেছিল, হে পুত্রগণ! আল্লাহই তোমাদের জন্য এই দ্বীন মনোনীত করেছেন, সুতরাং আত্মসমর্পণকারী না হয়ে তোমরা কখনো মৃত্যুবরণ করো না।-আল বাকারা ২ : ১৩০-১৩২

قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

* বল, আমার প্রতিপালক তো আমাকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন। সেটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন, ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ, সে ছিল একনিষ্ঠ এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।
* বল, আমার সালাত, আমার ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে। তাঁর কোন শরীক নেই। আমাকে এরই হুকুম দেওয়া হয়েছে এবং আমি তাঁর সম্মুখে সর্বপ্রথম মাথানতকারী।-আল আনআম ৬ : ১৬১-১৬৩

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী না হয়ে কোনো অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না।-আলে ইমরান ৩ : ১০২

আস্থা-ভালবাসা ও ভক্তি-শ্রদ্ধা ছাড়া ঈমান হয় না; বিদ্রূপ ও অবজ্ঞা অস্বীকারের চেয়েও ভয়াবহ কুফর

কোনো ব্যক্তি বা বিষয়ের প্রতি ঈমান তখনই হতে পারে যখন তার উপর থাকে পূর্ণ আস্থা, অন্তরে তাঁর প্রতি থাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল, তাঁর নাযিলকৃত আসমানী কিতাব, তাঁর বিধান ও শরীয়ত এবং তাঁর দীনের সকল নিদর্শনের সাথে মুমিনের সম্পর্ক ঐ আস্থা-বিশ্বাস এবং ভক্তি-শ্রদ্ধারই সম্পর্ক।যার প্রতি বা যে বিষয়ে ঈমান আনা হয়েছে তার প্রতি বা ঐ বিষয়ে আস্থা-বিশ্বাস এবং ভক্তি-ভালবাসাই হচ্ছে ঈমানের প্রাণ। চিন্তা-ভাবনা এবং আমল ও আলোচনার দ্বারা একে শক্তিশালী করা এবং গভীর থেকে গভীরতর করা প্রত্যেক মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব।

বিদ্বেষ ও ঈমান একত্র হওয়া অসম্ভব। যার প্রতি ঈমান থাকবে তার প্রতি ভালবাসাও থাকবে। পক্ষান্তরে যার প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা থাকবে তার প্রতি ঈমান থাকতে পারে না। অন্তরের বিদ্বেষ সত্ত্বেও যদি মুখে ঈমান প্রকাশ করে তবে তা হবে মুনাফিকী।

মুসলমানের ভালবাসা হবে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর নেক বান্দাদের প্রতি। আর কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকের ভালবাসা হবে তাদের নিজ নিজ উপাস্য ও নেতাদের প্রতি।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

তথাপি মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ ছাড়া অপরকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহকে ভালবাসার ন্যায় তাদেরকে ভালবাসে; কিন্তু যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ভালবাসায় তারা সুদৃঢ়।-আলবাকারা ২ : ১৬৫

(উক্ত তথ্যাবলি মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক উস্তাদের লেখা থেকে সংগৃহীত)

দ্বীনের ইলম অর্জন সফলতার পথ দেখায়

“পাঠ করুন আপনার পালনকর্তা নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন(সূরা আলাক:১)”

দ্বীন ইসলামের জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ।কিভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কে মেনে চলবে তা একমাত্র দ্বীনের শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমেই জানা যায়।

ইসলামে ইলমের গুরুত্ব অপরিসীম। মুসলিমের প্রতি ইসলামের প্রথম বার্তাই- اِقْرَ ْ- পড়, ইলম অর্জন কর। ইসলাম থেকে ইলমকে আলাদা করা অসম্ভব। ইসলামের প্রতিটি অংশের মধ্যেই ইলম বিরাজমান। ইলম ছাড়া যথাযথভাবে ইসলাম পালন সম্ভব নয়। ইলম ছাড়া ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন- কোনো ক্ষেত্রেই সত্যিকার অর্থে ইসলাম পালন সম্ভব নয়। তাবেঈ উমর ইবনে আব্দুল আযীয রাহ. বলেন-

من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح.

যে ব্যক্তি ইলম ছাড়া আমল করবে সে সঠিকভাবে যতটুকু করবে না করবে, বরবাদ করবে তার চেয়ে বেশি। -তারীখে তাবারী ৬/৫৭২

দ্বীনী ইলমের বিভিন্ন স্তর ও ভাগ রয়েছে। একটি ভাগ ফরযে আইন ও ফরযে কেফায়া হিসাবে। ফরযে আইন বলা হয়, যা শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। বিশেষভাবে এই প্রকারের ইলমের ব্যাপারেই হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

প্রত্যেক মুসলিমের উপর ইলম অর্জন করা ফরয। -মুসনাদে আবু হানীফা (হাছকাফী), হাদীস ১, ২; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২২৪

দ্বিতীয় প্রকারের ইলম হচ্ছে, ফরযে কেফায়া, যা স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয না হলেও সামষ্টিকভাবে সকলের উপর ফরয। অর্থাৎ সমাজের কিছু ব্যক্তি তা হাসিল করলে সকলের পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যাবে। আর কেউই হাসিল না করলে সকলেই দায়ী থাকবে। এ প্রকারের ইলম অনেক বিস্তৃত। এককথায় দ্বীনের সকল বিষয়ের গভীর জ্ঞান। যেহেতু এটি সামষ্টিকভাবে সকলের উপরই ফরয তাই সকলকেই এই দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতন থাকা চাই। কেউ যেন মনে না করে, এটি কেবল অমুক শ্রেণির দায়িত্ব। (সকল কথা ও আমলের আগে হচ্ছে সেই বিষয়ের ইলম।)

এই কারণে হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী রাহ. বলেছেন, যে আমলের যে হুকুম তার ইলম হাসিল করারও একই হুকুম। অর্থাৎ যেই আমলটি ইসলামে ফরয তার ইলম অর্জনও ফরয। যেটা ওয়াজিব তার ইলম অর্জন করাও ওয়াজিব। যেটা সুন্নত তার

ইলম অর্জনও সুন্নত। তদ্রƒপ যেটা হারাম তার ইলম অর্জন করা ফরয। যা মাকরূহে তাহরীমী তার ইলম অর্জন করা ওয়াজিব। এককথায় ইসলামের যেই বিষয়টি যত বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেই বিষয়ের ইলম অর্জন করাও তত বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সঠিক ইলম ছাড়া সঠিক আমল কখনোই সম্ভব নয়।

কুরআন-সুন্নাহ্য ইলম হাসিল করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ

পবিত্র কুরআনের পুরোটাই ইলম। কুরআন শিক্ষা করা, শিক্ষা দেওয়া, কুরআনের তালীম দেওয়া সবকিছুই ইলম চর্চার মধ্যে শামিল। কুরআনকে আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে যত জায়গায় বলা হয়েছে তার মধ্যে কুরআনের ইলম অর্জন করার বিষয়টি আবশ্যকীয়ভাবেই অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের ইলম অর্জনের গুরুত্ব কুরআনের মতই। কারণ আল্লাহ পাক কুরআন নাযিল করেছেন, যাতে আমরা এর ইলম অর্জন করি এবং সেই অনুযায়ী আমল করি। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেন-

وَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ.

তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল, যাতে তারা চিন্তা করে। -সূরা নাহ্ল (১৬) : ৪৪

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ.

তিনিই উম্মিদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য হতে, যে তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে; তাদের পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত; ইতিপূর্বে তো তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে। -সূরা জুমুআহ (৬২) : ২

সুতরাং আমরা যদি চাই, যে উদ্দেশ্যে কুরআন নাযিল ও নবী প্রেরণ করা হয়েছে তা পুরা হোক, তাহলে আমাদের উচিত হবে কুরআন-সুন্নাহ্র ইলম হাসিল করা। যাতে হাশরের ময়দানে নবী আমাদের বিরূদ্ধে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করে না বলেন-

يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا.

হে আমার প্রতিপালক, আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে বিলকুল পরিত্যাগ করেছিল। -সূরা ফুরকান (২৫) : ৩০

সূরা কাহাফে আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আ. ও হযরত খাযির আ.-এর ঘটনা উল্লেখ করে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, একজন অনেক উঁচু মর্যাদার নবীও ইলম ও হিকমত

শিক্ষার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন এবং আরেকজনের পিছে পিছে ঘুরেছেন। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে হযরত মূসা আ. খাযির আ.-কে বললেন-

هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا.

আমি কি তোমার অনুসরণ করব এই মর্মে যে, তুমি আমাকে হেদায়েতের বাণী শেখাবে, যা তোমাকে শেখানো হয়েছে। -সূরা কাহাফ (১৮) : ৬৬

হযরত মূসা ও খাযির আ.-এর ঘটনা সবিস্তারে কুরআনে কারিমে সূরা কাহাফের শেষে উল্লেখ আছে। সেখানে একজন ইলম অন্বেষণকারীর জন্য বহু শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে। কুরআনে কারীমের এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে দুআ শিখিয়েছেন-

رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا.

হে আমার প্রভু, আমার ইলম বৃদ্ধি করে দাও। -সূরা ত্ব-হা (২০) : ১১৪

আল্লামা কুরতুবী রাহ. বলেন, ইলমের চেয়ে অন্য কোনো আমল যদি আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় হতো তবে তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেটা বৃদ্ধির জন্যই দুআ করতে নির্দেশ দিতেন। কুরআনে কারিমে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইলম ছাড়া অন্য কোনো জিনিস বৃদ্ধির জন্য দুআ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়নি।এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَ لِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ.

মুমিনদের সকলের একসঙ্গে অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়, তাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বহির্গত হয় না কেন, যাতে তারা দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে। যাতে তারা সতর্ক হয়। -সূরা তাওবা (৯) : ১২২

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনী অধ্যয়ন করলে স্পষ্টভাবেই বুঝে আসে, তিনি ইলমকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয এবং বিরাট সওয়াবের কাজ হিসেবেই অবলম্বন করেছিলেন এবং এভাবে অবলম্বনের জন্যই উম্মতকে জোর তাকিদ করেছেন। ইলমের প্রতি এত উৎসাহ দিয়েছেন এবং এত অধিক ফযীলত বর্ণনা করেছেন যে, বৃদ্ধদের মাঝেও ইলম তলবের অদম্য স্পৃহা জেগে উঠেছে। শুধু তা-ই নয়, ইলমের প্রতি অনীহা প্রকাশকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।ইলমের প্রতি কোনো এক সম্প্রদায়ের অনাগ্রহের কথা জানার পর তিনি ইরশাদ করেন-

مَا بَالُ أَقْوَامٍ لَا يُفَقِّهُونَ جِيرَانَهُمْ، وَلَا يُعَلِّمُونَهُمْ، وَلَا يَعِظُونَهُمْ، وَلَا يَأْمُرُونَهُمْ، وَلَا يَنْهَوْنَهُمْ. وَمَا بَالُ أَقْوَامٍ لَا يَتَعَلَّمُونَ مِنْ جِيرَانِهِمْ، وَلَا يَتَفَقَّهُونَ، وَلَا يَتَّعِظُونَ. وَاللهِ لَيُعَلِّمَنَّ قَوْمٌ

جِيرَانَهُمْ، وَيُفَقِّهُونَهُمْ وَيَعِظُونَهُمْ، وَيَأْمُرُونَهُمْ، وَيَنْهَوْنَهُمْ، وَلْيَتَعَلَّمَنّ قَوْمٌ مِنْ جِيرَانِهِمْ، وَيَتَفَقّهُونَ، وَيَتَفَطّنُونَ، أَوْ لَأُعَاجِلَنّهُمُ الْعُقُوبَةَ .

ওই সম্প্রদায়ের কী হল যে, তারা প্রতিবেশীদেরকে দ্বীনের সঠিক সমঝ ও বুঝ দান করে না; দ্বীন শিক্ষা দেয় না, দ্বীনের বিষয়াবলী বোঝায় না, তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করে না, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে না? ওই সম্প্রদায়েরই বা কী হল যে, তারা প্রতিবেশী থেকে দ্বীন শেখে না, দ্বীনের সঠিক সমঝ ও বুঝ নেয় না, দ্বীনের বিষয়াদি বুঝে নেয় না? আল্লাহর কসম! হয়ত তারা তাদের প্রতিবেশীদেরকে দ্বীন শেখাবে, দ্বীনের সঠিক সমঝ ও বুঝ দান করবে, দ্বীনের বিষয়াদি বোঝাবে, সৎ কাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে আর যারা জানে না ওরা তাদের থেকে শিখবে, সঠিক বুঝ গ্রহণ করবে, দ্বীনের বিষয়াদি ভালোভাবে বুঝে নেবে নতুবা আমি তাদেরকে দুনিয়াতেই নগদ শাস্তি দিব। -আলমুজামুল কাবীর, তবারানী; মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ ১/১৬৪

ইলমে দ্বীন অর্জনের ফযীলত

সর্বপ্রথম কুরআনী ওহীতেই ইলমের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ، خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَق ، اِقْرَاْ وَ رَبُّكَ الْاَكْرَم، الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَم، عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন- সৃষ্টি করেছেন মানুষকে ‘আলাক’ হতে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না। -সূরা আলাক (৯৬) : ১-৫

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ.

বল, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? -সূরা যুমার (৩৯) : ৯

কুরআনে কারিমের অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ.

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন। -সূরা মুজাদালাহ (৫৮) : ১১

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

مَنْ يُرِدِ الله بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.

আল্লাহ পাক যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের সহীহ সমঝ দান করেন। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৭১; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০৩৭

আরো ইরশাদ করেছেন-

لاَ حَسَدَ إِلّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا.

দুই ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো ব্যাপারেই হিংসা হতে পারে না। এক. আল্লাহ পাক যাকে সম্পদ দান করেছেন আর সে ন্যায়ের পথে খরচ করতে থাকে। দুই. যাকে দ্বীনী জ্ঞান দান করেছেন আর সে তা দিয়ে বিচার করে এবং তা মানুষকে শেখায়। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮১৬

অন্য হাদীসে ইরশাদ করেছেন-

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنّةِ.

যেই ব্যক্তি ইলম তলবের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করবে আল্লাহ পাক এর বদৌলতে তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেবেন। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৯৯

হযরত সাফওয়ান ইবনে আস্সাল রা. বলেন, আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম। তখন তিনি মসজিদে বসে ছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি এসেছি ইলম শিক্ষা করার জন্য। তিনি বললেন, তালেবে ইলমকে মারহাবা। নিশ্চয় তালেবে ইলমকে ফিরিশতাগণ বেষ্টন করে রাখে এবং তাঁদের ডানা দিয়ে তাকে ছাঁয়া দিতে থাকে। অতঃপর তাঁরা সারিবদ্ধভাবে প্রথম আসমান পর্যন্ত মিলে মিলে দাঁড়িয়ে যায়। এসব কিছু তাঁরা সে যা অন্বেষণ করছে তার ভালবাসায় করে। -আখলাকুল উলামা, আর্জুরী ১/৩৭; তবারানী কাবীর, হাদীস ৭৩৪৭; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদীস ৫৫০

হাদীস শরীফে ইলম অন্বেষণের রাস্তাকেও আল্লাহর রাস্তা বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ العِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ.

যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের জন্য বের হল সে আল্লাহর রাস্তায় বের হল। -জামে তিরিমিযী, হাদীস ২৬৪৭

অন্য বর্ণনায় এভাবে এসেছে-

مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا، لَمْ يَأْتِهِ إِلّا لِخَيْرٍ يَتَعَلّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ.

যেই ব্যক্তি আমার মসজিদে আসল শুধু একারণে যে, সে কোনো কল্যাণের বাণী শিখবে অথবা শেখাবে সেই ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর ন্যায়। -সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২২৭; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৯৪১৯

অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

যখন মানুষ মারা যায় তার সকল আমলের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। শুধু তিনটি রাস্তা খোলা থাকে। এক. ছদকায়ে জারিয়া। দুই. এমন ইলম, যা থেকে (মানুষ) উপকৃত হয়। তিন. নেক সন্তান, যে তার জন্য দুআ করে। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৬৩১

আরো ইরশাদ হয়েছে, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে কুরআন মাজীদ শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০২৭

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু জর রা.-কে সম্বোধন করে বলেছেন, হে আবু জর, কুরআনের একটি আয়াত শিক্ষা করা তোমার জন্য একশ রাকাত নফল নামায পড়ার চেয়েও উত্তম। ইলমের একটি অধ্যায় শিক্ষা করা তোমার জন্য এক হাজার রাকাত নফল নামায পড়ার চেয়েও উত্তম। চাই এর উপর আমল করা হোক বা না হোক। -সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২১৯

আল্লাহ বলেন-

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

এবং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং রুকূকারীদের সঙ্গে রুকূ কর।- সূরা বাকারা (২) : ৪৩

অন্যত্র বলেছেন-

وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ هُوَ مَوْلٰىكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ.

এবং তোমরা আল্লাহর পথে সাধনা কর, যেমন সাধনা করা উচিত। তিনি তোমাদের মনোনীত করেছেন এবং দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি কোনো সংকীর্ণতা আরোপ করেননি। তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দ্বীন (-কে আঁকড়ে ধর)। তিনিই তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলিম, পূর্বেও এবং এ কিতাবেও, যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হয় আর তোমরা (অন্যান্য) মানুষের জন্য সাক্ষী হও। সুতরাং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহকে মজবুতভাবে ধর। তিনিই তোমাদের অভিভাবক। তিনি কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।-সূরা হজ্ব (২২) : ৭৮

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে (উম্মতে মুহাম্মাদী) সাক্ষী সাব্যস্ত করেছেন। কিয়ামতের দিন যখন অন্য উম্মতেরা অস্বীকার করে বলবে যে, নবীগণ আমাদের নিকট দ্বীনের কথা পৌঁছাননি তখন উম্মতে মুহাম্মাদী নবীদের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে-নিশ্চয় নবীগণ

দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। বলাবাহুল্য, উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর এটা আল্লাহর বড় নিআমত। এ নিআমতের শোকরিয়া স্বরূপ আল্লাহ তাদেরকে নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা এবং তাঁকে মজবুতভাবে ধরার আদেশ করেছেন।

অপর আয়াতে নবীজীকে লক্ষ করে বলেছেন-

قُلْ لِّعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ.

আমার যে বান্দাগণ ঈমান এনেছে তুমি তাদেরকে বল, তারা যেন নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে, সেই দিন আসার আগে, যে দিন কোনো বেচাকেনা থাকবে না এবং বন্ধুত্বও থাকবে না।-সূরা ইবরাহীম (১৪) : ৩১

এখানে আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে তাঁর বান্দাদেরকে নামাযের আদেশ করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় নামায অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কিয়ামতের কঠিন সময়ে তা উপকারে আসবে।

নবীজীকে লক্ষ করে আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেছেন-

اُتْلُ مَآ اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ.

ওহীর মাধ্যমে তোমার প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা তিলাওয়াত কর ও নামায কায়েম কর। নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে আর আল্লাহর যিকিরই সবচেয়ে বড়। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা জানেন।-সূরা আনকাবুত (২৯) : ৪৫

এখানেও নামাযের আদেশ করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এর কিছু উপকারিতাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, তা অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। হাঁ, নামাযের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তা অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে। তবে প্রাণবন্ত নামায হতে হবে। যেরূপ নামাযের কথা কুরআন ও হাদীস বলে।

নামায প্রতিষ্ঠা

একমাত্র মুমিনই আল্লাহর কাছে মর্যাদাশীল। আর কুরআনে বহু জায়গায় মুমিনদের একটি গুণ এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা নামায কায়েম করে। এর মধ্য দিয়ে আল্লাহ বস্তুত নামাযের উপর গুরুত্বারোপ করছেন যে, যদি মুমিন হও তাহলে নামায কায়েম কর। যেমন আল্লাহ ইরশাদ করেন-

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ.

তোমাদের বন্ধু তো কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ, যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং তারা বিনয়ী।-সূরা মায়েদা (৫) : ৫৫

নিশ্চয় সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ- যারা তাদের নামাযে বিনীত, যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে, যারা যাকাত আদায়কারী, যারা নিজ লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, তবে নিজেদের স্ত্রী বা মালিকানাধীন দাসীদের থেকে নয়, কেননা (এতে) তারা নিন্দনীয় হবে না। আর যারা এ ছাড়া (অন্য পথ) অন্বেষণ করে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী এবং যারা নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং যারা নিজেদের নামাযসমূহের প্রতি যত্নবান থাকে। তারাই উত্তরাধিকার লাভকারী, যারা জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকার লাভ করবে। তারা তাতে সর্বদা থাকবে।-সূরা মুমিনুন (২৩) : ১-১১

ঈমান ও কুকুরের মধ্যে পার্থক্য করে নামাজ। কাফের ও মুমিনের মধ্যে পার্থক্য হলো নামাজ। কাফের নামাজ আদায় করে না মমিন নামাজ আদায় করে। জাবের রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা হতে বর্ণিত তিনি বলেন আমি নবীজীকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে শুনেছি বান্দা এবং শিরক ও কুকুরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে নামাজ পরিত্যাগ করা সহীহ মুসলিম ৮২। অর্থাৎ নামাজ পরিত্যাগ করলে বান্দা কুফরের কাছাকাছি পৌঁছে যায় নামাজ আদায় জান্নাতে যাওয়ার অন্যতম প্রধান উপায় নামাজ জান্নাতের চাবি আর নামাজ ত্যাগ জাহান্নামে যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন জাহান্নামিদের প্রশ্ন করা হবে কিসে তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করালো আমরা তারা বলবে আমরা সালাত আদায়কারীদের মধ্যেও ছিলাম না'(সূরা মুদ্দাসিসর :৪২,৪৩)

রোজা মুমিনের ঢালস্বরূপ:

রমযানুল মুবারক। বছরের বার মাসের সর্বাধিক মর্যাদাশীল ও মহিমান্বিত মাস। এ মাসে আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীম নাযিল করেছেন, যা সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব এবং মানবজাতির হেদায়েতের দিশারী। এ মাসে তিনি রেখেছেন 'লাইলাতুল কদর', যা হাজার

মাস অপেক্ষা উত্তম। এ মাসের দিবসে তিনি ফরয করেছেন সিয়াম, যা ইসলাম ধর্মের মূল পাঁচ ভিত্তির একটি। আর রাতে রয়েছে তারাবীহ্র বিধান, যা আবদ ও মাবূদের মাঝে কিয়ামুল লাইল ও তিলাওয়াতুল কুরআনের মাধ্যমে নিগূঢ় সম্পর্ক স্থাপনের অনন্য মাধ্যম। এ মাসে সুন্নত করা হয়েছে ইতিকাফ, যাতে বান্দা তার রবের ঘরে, তাঁর একান্ত মেহমান হয়ে কিছু সময় গুযরান করে। এ মাসকে ঘিরে হুকুম করা হয়েছে সদাকাতুল ফিত্রের, যাতে গরীবের মুখেও আনন্দের হাসি ফোটে। দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর পুরস্কার দিবসের বার্তা নিয়ে উদিত হয় ঈদের চাঁদ, যাতে বান্দা তার প্রভুর কাছ থেকে লাভ করতে পারে রহমত ও মাগফেরাতের ইনাম।

এ মাস কুরআন নাযিলের মাস। খায়র ও বরকতের মাস। তাকওয়া অর্জনের মাস। আমলে অগ্রগামী হওয়ার মাস। নেকী হাছিলের মাস। গুনাহ বর্জন করার মাস। ক্ষমা লাভের মাস। প্রবৃত্তির লাগাম টেনে ধরার মাস। সংযম-সাধনার মাস। ভ্রাতৃত্ব চর্চার মাস। সহানুভূতির মাস। দেহমন শুদ্ধ ও পবিত্র করার মাস।

এ মাসে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। আল্লাহ পাকের রহমত ও করুণা বান্দার প্রতি অধিক নিবিষ্ট হয়, নেক ও কল্যাণের দিকে ধাবিত হওয়া সহজ হয়। জাহান্নামের কপাটগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। গুনাহের তাড়না দমিত হয়। এ মাসে শয়তান শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকে। তার ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণা নিষ্ক্রিয় হয়। এ মাসে আল্লাহ তাআলা অসংখ্য জাহান্নামীকে মুক্ত করে থাকেন জাহান্নামের আগুন থেকে। অতএব এ মাস হল আল্লাহমুখী হওয়া, তাঁর প্রিয়পাত্র হওয়া, তাকওয়া হাছিল করা এবং গুনাহ থেকে পাক-ছাফ হয়ে তাঁর নৈকট্য অর্জনের মোক্ষম সময়। আর তাই রমযানের চাঁদ উঠতেই ঘোষণা হতে থাকে

يَا بَاغِيَ الخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَا

মুমিনের জন্য এ মাস নেকী লাভ ও তাকওয়া অর্জনের বসন্ত। এ মাসে সে সংগ্রহ করে তার গোটা বছরের ঈমানী আমলী এবং আত্মিক পরিশুদ্ধির পাথেয়। সর্বোপরি এ মাস প্রস্তুতি গ্রহণের মাস, তাকওয়ায় বলীয়ান হওয়ার মাস।

মুসলমানদের জন্য এর চেয়ে উত্তম মাস আর নেই এবং মুনাফিকদের জন্য এর চেয়ে ক্ষতির মাসও আর নেই। মুসলমান এ মাসে (গোটা বছরের জন্য) ইবাদতের শক্তি ও পাথেয় সঞ্চয় করে। এ মাস মুমিনের জন্য গনীমত এবং মুনাফিকের জন্য ক্ষতির কারণ। (দ্রষ্টব্য : মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৮৩৬৮)বস্তুত মুমিনের শানই হচ্ছে, আল্লাহর দেওয়া রমযানের উপঢৌকনকে সে গনীমত মনে করবে এবং এ থেকে সে বেশি থেকে বেশি উপকৃত হতে সচেষ্ট ও তৎপর থাকবে। আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদের জন্য রমযান মাসের রোযা ফরয করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিল, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার। সূরা বাকারা (২) : ১৮৩
রমযান মাসের রোযা এতটা মহিমান্বিত একটি আমল, যার মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বান্দার অতীতের সকল গুনাহ-খাতা ক্ষমা করে দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনÑ

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِه.

যে ব্যক্তি ঈমান এবং ইহতিসাব তথা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস এবং সওয়াবের প্রত্যাশা রেখে রমযান মাসে রোযা রাখবে, তার পূর্বের গুনাহগুলো মাফ করে দেওয়া হবে। সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৮
আল্লাহ তাআলা নিজে রোযার প্রতিদান দেবেনআল্লাহ তাআলার নিকট বান্দার সকল আমল একরকম আর রোযার হিসাব ভিন্ন রকম। আল্লাহ্র নিকট বান্দা আমলের প্রতিদান লাভ করবে। তবে রোযার প্রতিদান আল্লাহ নিজে বান্দাকে দান করবেন। আল্লাহ কেমন প্রতিদান দেবেন তা আল্লাহ্ই ভালো জানেন।
প্রতিদান আল্লাহ বিশেষভাবে দেবেন তা তাঁর শান মোতাবেক দেবেন। রোযার ক্ষেত্রে বান্দার জন্য আল্লাহ্র তরফ থেকে এত বড় সম্মান ও পুরস্কার এ জন্য যে, রোযা সাধারণত আল্লাহ্র জন্যই হয়ে থাকে। অন্যান্য আমলের তুলনায় রোযার ক্ষেত্রে রিয়ার আশঙ্কাও কম থাকে। সেজন্যই আল্লাহ বলেছেন, রোযা আমার জন্য। আর এজন্যই আল্লাহ নিজে এর প্রতিদান দান করবেন।
দ্বিতীয়ত রোযাদারের জন্য এত বড় পুরস্কার এজন্যও যে, আল্লাহ তাআলা অন্যান্য সময় তার জন্য যা হালাল করেছেন রোযা অবস্থায় দিনের বেলা কেবল আল্লাহ্র হুকুমের কারণে সে তা থেকে বিরত থাকছে। সে পানাহার ও বৈধ জৈবিক চাহিদা দমন করছে কেবল আল্লাহ তাআলার হুকুম পালনের লক্ষ্যে এবং একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। অথচ এগুলো এমন বিষয়, একমাত্র আল্লাহ্র ভয়, তাঁর প্রতি বিশ্বাস এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের প্রত্যাশা ব্যতীত এ থেকে নিবৃত্ত থাকা সম্ভব নয়।

রোযা ঢাল স্বরূপ

এ হাদীসে রোযাকে ঢাল সাব্যস্ত করা হয়েছে। মুমিনের রোযা তার জন্য ঢাল হবে। অর্থাৎ ঢাল যেভাবে মানুষকে রক্ষা করে তেমনি রোযাও রোযাদারকে রক্ষা করবেÑ তাকওয়া হাছিলের প্রতিবন্ধকতা থেকে, গুনাহ থেকে বাঁচার ক্ষেত্রে, প্রবৃত্তি অবদমিত করার ক্ষেত্রে,

কবরে-হাশরে এবং আখেরাতের সকল ঘাঁটিতে, এমনকি জাহান্নামের ভয়াবহ আগুন থেকে রোযা তাকে রক্ষা করবে। তাই রোযাদারের কর্তব্য হল, তার রোযা যাতে ঢাল হয় সেই চেষ্টা করা এবং এ ঢালকে অক্ষুণœ রাখা; বিদীর্ণ হওয়া থেকে রক্ষা করা। হাদীস শরীফে এসেছেÑ

الصّومُ جُنّةٌ مَا لَمْ يَخْرِقْهَا.

রোযা ঢাল স্বরূপ, যতক্ষণ না তা বিদীর্ণ করে ফেলা হয়। মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৬৯০, ১৭০০;

কোন শরীয়ত ছাড়া কোন মুসলমান যদি রমজান মাসের একটি রোজা ও ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগ করে তাহলে সে বড় পাপী ও জঘন্য অপরাধীর রূপে গণ্য হবে। দিনের মৌলিক বিধান লঙ্ঘনকারী ও ঈমান ইসলামের ভিত্তি বিনষ্টকারী হিসেবে পরিগণিত হবে। হাদিস শরীফে স্থগিত ভাবে রোজা ত্যাগ করি ও ভঙ্গ কারীর জন্য কঠিন শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। রমজান মাসের একদিন রোজা না রাখলে মানুষ শুধু গোনাগারি হয় না ওই রোজার পরিবর্তে আজীবন রোজা রাখলেও রমজানের এক রোজার যে মর্যাদা ও কল্যাণ যে অনন্ত রহমত ওখায়ের বরকত তা কখনো লাভ করতে পারবে না এবং কোন ভাবেই এর যথার্থ ক্ষতিপূরণ আদায় হবে না।

হজ্বে বায়তুল্লাহ-মুমিনের দীলের তামান্না

ইসলামের মূল স্তম্ভসমূহের পঞ্চমটি হল হজ্বে বায়তুল্লাহ। ঈমান, নামায, যাকাত ও রোযার পরই হজ্বের অবস্থান। হজ্ব মূলত কায়িক ও আর্থিক উভয়ের সমন্বিত একটি ইবাদত। তাই উভয় দিক থেকে সামর্থ্যবান মুসলিমের উপর হজ্ব পালন করা ফরয। অর্থাৎ হজ্ব আদায়ে সক্ষম এমন শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচাপাতি ও আসবাবপত্রের অতিরিক্ত হজ্বে যাওয়া-আসার ব্যয় এবং হজ্ব আদায়কালীন সাংসারিক ব্যয় নির্বাহে সক্ষম এমন সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর হজ্ব আদায় করা ফরয। হজ্ব প্রত্যেক মুসলমানের উপর সারা জীবনে একবারই ফরয হয়। একবার ফরয হজ্ব আদায়ের পর পরবর্তী হজ্বগুলো নফল হিসেবে গণ্য হবে। এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন-

يا أيها الناس! إن الله كتب عليكم الحج، فحجوا، فقال رجل : أكل عام يا رسول الله؟ فكست حتى قالها ثلاثا، ثم قال : لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم.

হে মানবসকল! আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর হজ্ব ফরয করেছেন। সুতরাং তোমরা হজ্ব করো। এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! প্রতি বছর কি হজ্ব করতে হবে? তিনি চুপ রইলেন এবং লোকটি এভাবে তিনবার জিজ্ঞেস করল। অতপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি যদি হ্যাঁ বলতাম, তাহলে তা (প্রতি বছর হজ্ব করা) ফরয হয়ে যেতো, কিন্তু তোমাদের পক্ষে তা করা সম্ভব হতো না।-সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৩৩৭ (৪১২);

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، ومن كفر فان الله غنى عن العلمين.

(তরজমা) মানুষের মধ্যে যারা সেখানে (বায়তুল্লাহ) পৌঁছার সামর্থ্য রাখে তাদের উপর আল্লাহর উদ্দেশ্যে এ গৃহের হজ্ব করা ফরয। আর কেউ যদি অস্বীকার করে তাহলে তোমাদের জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিজগতের প্রতি মুখাপেক্ষী নন।-সূরা আলে ইমরান (৩) : ৯৭

আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه.

যে ব্যক্তি হজ্ব করে আর তাতে কোনোরূপ অশ্লীল ও অন্যায় আচরণ করে না তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।-সুনানে তিরমিযী, হাদীস :

হজ করার শক্তি সামর্থ্য ও অর্থবিদ্যা থাকার পরও যে ব্যক্তি হজ করেনা তার সম্পর্কে হাদীস শরীফে কঠোর হুমকি প্রদান করা হয়েছে অমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেছেন যে ব্যক্তি হজ করার সামর্থ্য রাখে তবুও হজ করে না সে ইহুদি হয়ে মৃত্যুবরণ করল কি খ্রিস্টান হয়ে তার কোন আল্লাহর নেই। (তাফসীরে ইবনে কাসির)

যাকাত আদায়

: যাকাত ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রোকন। ঈমানের পর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য ইবাদত হল সালাত ও যাকাত। কুরআন মজীদে বহু স্থানে সালাত-যাকাতের আদেশ করা হয়েছে এবং আল্লাহর অনুগত বান্দাদের জন্য অশেষ ছওয়াব, রহমত ও মাগফিরাতের পাশাপাশি আত্মশুদ্ধিরও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ وَ مَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۱۱۰

‘তোমরা সালাত আদায় কর এবং যাকাত প্রদান কর। তোমরা যে উত্তম কাজ নিজেদের জন্য অগ্রে প্রেরণ করবে তা আল্লাহর নিকটে পাবে। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখছেন। -সূরা বাকারা : ১১০

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ۵۶

‘তোমরা সালাত আদায় কর, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পার।’-সূরা নূর : ৫৬

সূরা নিসার ১৬২ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের জন্য ‘আজরুন আযীম’-এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে-

وَ الْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَ الْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ اُولٰٓئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا۱۶۲

‘এবং যারা সালাত আদায় করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখে আমি তাদেরকে মহাপুরস্কার দিব।’

অন্য আয়াতে যাকাতের গুরুত্বপূর্ণ সুফল বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা বলেন-

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ؕ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْم۱۰۳

‘তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করুন, যার দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং পরিশোধিত করবেন এবং আপনি তাদের জন্য দুআ করবেন। আপনার দুআ তো তাদের জন্য চিত্ত স্বস্তিকর। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।’-সূরা তাওবা : ১০৩

(উক্ত তথ্যসমূহ মাসিক আল কাউসার পত্রিকা থেকে সংগৃহীত)

পরিশুদ্ধ হৃদয় সফলতার মানদণ্ড:

অবশ্যই সে সফল হয়েছে, যে নফসকে পরিশুদ্ধ করেছে।

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا.

অবশ্যই সে সফল হয়েছে, যে নফসকে পরিশুদ্ধ করেছে। আর সে ব্যর্থ হয়েছে, যে তা বিনষ্ট করেছে। —সূরা শামস (৯১) : ৯-১০

প্রতিটি মানুষের জীবন ও ব্যক্তিত্বের প্রাথমিক প্রকাশ ঘটে থাকে তার নৈমত্তিক কাজকর্মে। একান্ত আলাপচারিতা, ব্যক্তিগত পর্যায়ে দেওয়া উপদেশ ও পরামর্শ, জনসম্মুখে দেওয়া ভাষণ ও বিবৃতি এবং নিজস্ব জীবনাচার ও বিভিন্ন পর্যায়ে কৃত লেনদেনে একজন মানুষের সাধারণ পরিচয় ফুটে ওঠে। স্পষ্ট হয় তার চিন্তা, রুচি, দৃষ্টিভঙ্গি ও মন মানসিকতা। তবে

এর মূলে যে প্রভাব ও ভূমিকা থাকে তার কেন্দ্রবিন্দু হল মানুষের নফস ও কলব, তথা হৃদয় ও অন্তর। সেখানেই মানুষের ভাব ও ভাবনা লালিত—পালিত হয়। বোধ ও বিশ্বাসের চর্চা-পরিচর্যা হয়। এককথায় মানুষের বাহ্যিক জীবনের মৌলিক বিষয়গুলো তার একান্ত ভেতর থেকেই পরিচালিত হয়। তাই কুরআন ও হাদীসে মানুষের বাহ্যিক জীবনকে যেমন সুন্দর ও নিয়মসিদ্ধ করার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, অভ্যন্তরীণ অবস্থাকেও পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করার প্রতি জোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

একজন মানুষের দুনিয়াবী জীবনের কীর্তি ও সৌন্দর্য এবং পরকালীন জীবনের স্থায়ী সফলতা অর্জনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা থাকে তার নফসের। নফসের শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা, নির্মলতা ও কলুষতা এবং পবিত্রতা ও অপবিত্রতা— প্রতিনিয়তই প্রকাশ পেতে থাকে তার প্রতিটি পদক্ষেপে। জীবনের এ পদক্ষেপগুলোই মানুষকে দাঁড় করিয়ে দেয় হয়ত সফলতার উচ্চ শিখরে কিংবা ব্যর্থতার গভীর গিরিখাদে। তাই কুরআন মাজীদ খুব পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে এ নিগূঢ় রহস্য। ইরশাদ করেছে—

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا.

অবশ্যই সে সফল হয়েছে, যে নফসকে পরিশুদ্ধ করেছে। আর সে ব্যর্থ হয়েছে, যে তা বিনষ্ট করেছে। —সূরা শামস (৯১) : ৯-১০

নফসকে পরিশুদ্ধ করার অর্থ হল, সব ধরনের পাপাচার ও কলুষতা থেকে মুক্ত করা। পাপচিন্তা, পাপ-ইচ্ছা ও পাপাচারী মানসিকতা থেকে রক্ষা করা। প্রবৃত্তি ও রিপুশক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। মনের সকল চাহিদা ও ইচ্ছাকে আকল ও বিবেকের অনুগামী করা। এরপর আকল ও বিবেককে আল্লাহ তাআলার হুকুম ও বিধানের অনুগত করা।

নফসকে বিনষ্ট করার অর্থ হল, বিভিন্ন প্রকারের গোনাহ ও মন্দকাজে লিপ্ত হয়ে নিজের চিন্তা, কর্ম ও মন-মানসিকতাকে পাপাচ্ছন্ন করে ফেলা। মনের সকল ইচ্ছা ও চাহিদাকে অনুসরণ করে করে প্রবৃত্তি-রিপুকে শক্তিশালী করা এবং আকল ও বিবেককে রিপুর অনুগামী করা। এভাবে আল্লাহর হুকুম ও বিধান থেকে সরে গিয়ে নিজের কামনা ও বাসনার অনুগত হওয়া। (দ্র. তাফসীরে ইবনে কাসীর ৪/৮১৬; রূহুল মাআনী ১৫/১৬৫; তাফসীরে উসমানী, পৃষ্ঠা ৭৯৩

অন্তরের রোগ বৃদ্ধি পায় কিভাবে, কিভাবে মানুষ ব্যার্থতার দিকে ধাবিত হয়:

অন্তরের এজাতীয় রোগ ও ব্যাধি কীভাবে বৃদ্ধি পায় সে বিষয়ে পরিষ্কারভাবে আলোচনা করা হয়েছে একটি হাদীসে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন— 'বান্দা যখন কোনো গোনাহ করে তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। এরপর যখন সে গোনাহ থেকে নিবৃত্ত হয়, ক্ষমা চায় এবং তাওবা করে তখন তার অন্তর পরিষ্কার করে দেওয়া হয়। নতুবা পুনরায় গোনাহ করতে থাকলে সেই কালো দাগ আরও বাড়তে থাকে। একপর্যায়ে পুরো অন্তর (কালো দাগে) ছেয়ে যায়। সেটাকেই আল্লাহ তাআলা মরিচা বলে উল্লেখ করেছেন—

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰي قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ .

বরং তাদের কৃতকর্ম তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে। [সূরা মুতাফফিফীন (৮৩) : ১৪] —জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৩৩৪

মরিচার আস্তর জমে লৌহধাতু যেমন তার স্বাভাবিকতা, স্বচ্ছতা, সৌন্দর্য ও কার্যক্ষমতা হারাতে থাকে, মানব হৃদয়ও তেমনি হারাতে থাকে তার স্বভাব শক্তি। ফলে জীবনের বিশুদ্ধতা বিনষ্ট হতে থাকে, স্বাভাবিক-শুদ্ধ পথে চলা মন্থর হতে থাকে, হ্রাস পেতে থাকে পাপ প্রতিরোধের কুদরতী ক্ষমতা। আর তখনই মানুষ তার মানবমর্যাদা থেকে নিচে নামতে শুরু করে। সম্ভাবনার সকল দুয়ার থেকে দূরে সরতে থাকে। জীবন পর্যবসিত হয় গ্লানিমাখা ব্যর্থতায়।

(উক্ত তথ্যাবলি মাওলানা মোঃ তাহিদুল ইসলাম ত্যায়িব উস্তাদের লেখা থেকে সংগৃহীত)

বর্ষ: ১৫, সংখ্যা: ১১রবিউস আখির ১৪৪১ || ডিসেম্বর ২০১৯

আল্লাহর নিকট ইসলাহের তাওফীক প্রার্থনা

আমার হযরত (ডা. অবদুল হাই আরেফী) রাহ. বলতেন- আল্লাহ তাআলা বড়ই দয়ালু ও মেহেরবান। মা-বাবার চেয়েও বহুগুণে বেশি। অতএব আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট নিঃসঙ্কোচে চাইতে থাক। এভাবে বল যে, আয় আল্লাহ! আপনি দুনিয়াতে আমাকে ভালো কাজ করার তাওফীক দিন অথবা আখেরাতের পাকড়াও থেকে রেহাই দিন। আমি আপনার দরবারে আমার সার্বিক বিষয় অর্পণ করছি। আপনি আমার হালত দুরস্ত করে দিন, আমাকে ইসলাহ করে দিন অথবা আখেরাতের আযাব থেকে মুক্তি দিন। এভাবে আল্লাহর কাছে চাইতে থাক। মানুষ এগুলোকে মামুলি বিষয় মনে করে। এজন্য এর প্রতি এত গরজ করে

না। কিন্তু বাস্তবতা হল, ইসলাহের জন্য এটা অনেক মুফীদ ও উপকারী একটি মাধ্যম। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার নিকট সবসময় নাছোড়বান্দা হয়ে চাইতে থাকা।
আর যে ব্যক্তি এভাবে নিয়মিত দুআ করে সে অবশ্য নিজের সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টাও অব্যাহত রাখে। এজন্য দুআর অর্থ কখনও এই নয় যে, শুধু দুআই করে যাব। চেষ্টা, মেহনত-মোজাহাদা কোনো কিছুই আর করা লাগবে না! বরং আল্লাহ তাআলা সর্বক্ষেত্রে এ হুকুম দিয়েছেন যে, তুমি তোমার পক্ষ থেকে সর্বাত্মক চেষ্টা মেহনত কর এবং আমার কাছে দুআ কর। চেষ্টাও অব্যাহত রাখ এবং দুআও করতে থাক। তো যে এভাবে চেষ্টা ও দুআ একসাথে জারি রাখবে, এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার মোআমালা বা আচরণ হল- আল্লাহ তাআলা একে আযাব দিবেন না। আল্লাহ তাআলা তাকে গুনাহ ও নাফরমানী থেকে হেফাযত করবেন। নতুবা কম সে কম তাকে মাফ করে দিবেন।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

আমি আপনাদেরকে একটি ঘটনা শোনাই। ঘটনাটি আমার নিজের সাথেই ঘটেছে। আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগে জার্মান থেকে আমার কাছে এক ব্যক্তির একটি চিঠি আসে। সে মূলত পাকিস্তানী। পরবর্তীতে জার্মানের নাগরিক হয়ে গেছে। তার নামটা এখনও আমার মনে আছে- আবদুল লতীফ। সে চিঠিতে উল্লেখ করে- আমি রুটিরুজির তালাশে পাকিস্তান থেকে জার্মান চলে আসি। তখন ধর্মকর্মের প্রতি আমার আগ্রহ-আকর্ষণ কিছুই ছিল না। নামায-রোযা বা অন্য কোনো দ্বীনী বিষয়ের প্রতি আমার কোনো ভ্রুক্ষেপই ছিল না। ব্যস ুরফে পেটের দায়ে পাকিস্তান ছেড়ে জার্মানে পাড়ি জমাই এবং এখানেই স্থায়ী হয়ে যাই। এখানে থাকতে থাকতে জার্মানী এক মেয়ের সাথে আমার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সে খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারী। তখন দ্বীন-ঈমানের প্রতি আমার মোটেও তাওয়াজ্জুহ ছিল না। নামায-রোযা, যাকাত, কুরবানী কোনো বিষয়ে কোনো খবর নেই। একেবারে বেলাগাম চলতে থাকি। আমাদের মাঝে সম্পর্ক আরো গভীর হতে থাকে। একপর্যায়ে আমরা বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হই এবং আমি ওরকমই উদাস জীবন যাপন করতে থাকি। আমাদের ঘর-সংসার যথারীতি চলতে থাকে। কিছুদিন পর আমি এক পুত্রসন্তানের পিতা হই।ছেলে আমার ধীরে ধীরে বেড়ে উঠতে থাকে। যখন তার কিছুটা পড়ার বয়স হয়, দেখি তার মা তাকে ঈসায়ী ধর্মমতের দীক্ষায় বড় করছে। এ দেখে আচানক আমার ভেতর থেকে একটি মুসলিম সত্তা জেগে ওঠে। গায়রত যেন আমার পুরো দেহটাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে তোলে- আরে! এ তোর সন্তান হয়ে এখন কি না ঈসায়ী দীক্ষা গ্রহণ করছে! ঐদিন থেকে আমি আমাকে ভিন্নভাবে উপলব্ধি করছি। আমি সংকল্প করলাম, আমি ওকে এ থেকে অবশ্যই বিরত রাখব। আমি ওর মাকে বললাম, এ আমার ছেলে। তুমি একে তোমার মনমত খ্রিস্টধর্ম

অনুসারে শিক্ষা দিতে পার না। সে আমাকে পাল্টা জবাবে বলে, কেন আমি তাকে শেখাব না? সে আমারও সন্তান। আমি আমার নিকট যা সত্য ও সঠিক মনে করি আমার ছেলেকে তা অবশ্যই শেখাব। তুমি আমাকে এতে কোনোভাবেই বাধা দিতে পার না। আমি তাকে বললাম- না, তোমার ধর্ম সঠিক নয়; আমার ধর্মই সঠিক। সে আমাকে বলে, তোমার ধর্ম কেন সঠিক? আমাকে বুঝিয়ে বল। এখন যখন ধর্ম নিয়ে তার সাথে আলোচনা শুরু হল, দেখি যে, খ্রিষ্টধর্ম সম্পর্কে তো তার যথেষ্ট ধারণা রয়েছে; কিন্তু আমি তো আমার ধর্ম সম্পর্কে কিছুই জানি না। ফল এই দাঁড়াল যে, ধর্ম বিষয়ে যখনই বিতর্ক হয় সে জিতে যায় আর আমি কোনো কিছুই বলতে পারি না। এভাবেই এখন সংসার চলছে।

এই সংকটময় পরিস্থিতিতে আমি নামায-রোযার প্রতি কিছুটা মনোযোগী হই। কিছুটা ধর্ম পালন শুরু করি। কিন্তু ধর্ম নিয়ে কথা বলতে গেলে আমি তার সাথে আর পেরে উঠি না। হযরত! সে আমার সন্তানের জীবন ধ্বংস করছে। তাকে খ্রিস্টান বানিয়ে ফেলছে। আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, আপনি আমাকে উদ্ধার করুন।

এ চিঠি আমার নিকট পৌঁছে। আমি আল্লাহর কাছে দুআ করি- আল্লাহ, বেচারা কঠিন মছিবতে ফেঁসে আছে। আপনি আমার মনে এরকম কোনো মশওয়ারা ঢেলে দিন, যাতে এর একটি সুরাহা হয়।

(এভাবে দুআ-দরূদ পড়ে) আমি তার কাছে জবাবী পত্র লিখি- খ্রিস্টবাদ বিষয়ে আমার একটা কিতাব রয়েছে। উর্দুতে ‘ঈসাইয়্যত কেয়া হ্যয়’ নামে আর ইংরেজিতে ডযধঃ ওং ঈযৎরংঃরধহরঃু নামে (এবং বাংলায় ‘খৃস্টধর্মের স্বরূপ’ নামে) প্রকাশিত হয়েছে। আপনি নিজ থেকে তার সাথে এ বিষয়ে কোনো বিতর্কে জড়াবেন না। কারণ বিতর্কে তেমন ফল হয় না। বিশেষ করে যখন ধর্ম সম্পর্কে আপনি তেমন কিছুই জানেন না। এজন্য আমার পরামর্শ হল- আপনি তাকে যেভাবে পারেন দুটি কাজ করতে প্রস্তুত করুন। এক. আমি এ কিতাবটি পাঠাচ্ছি। আপনি তাকে এটা পড়ার অনুরোধ করুন। দুই. তাকে বলুন যে, তুমিও আল্লাহকে বিশ্বাস কর আমিও আল্লাহকে বিশ্বাস করি। তুমি প্রতি রাতে উঠে আল্লাহর কাছে এভাবে দুআ কর যে, আয় আল্লাহ! যদি ঈসায়ী ধর্ম সত্য হয়, তাহলে আমি যেন তাতে অবিচল থাকি। আর যদি ইসলাম ধর্ম সত্য হয়ে থাকে, তাহলে এর সত্যতা আমার অন্তরে গেঁথে দিন এবং তা মেনে নেওয়া আমার জন্য সহজ করে দিন। এভাবে তাকে দুআ করার জন্য প্রস্তুত করুন।

কয়েকদিন পর তার দ্বিতীয় পত্র আসে, হযরত! সে কাজ দুটি করতে রাজি হয়েছে। আপনার কিতাব পড়া শুরু করে দিয়েছে এবং রাতে উঠে উঠে দুআও করছে। কিন্তু এখনও কোনো পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে না। আগে যেমন ছিল তেমনি আছে। ইসলামের প্রতি সে কোনো আকর্ষণ বোধ করছে না।

আমি এর জবাবে লিখি, 'ঘাবড়াবেন না। তাকে বলবেন, সে যেন দুআ অব্যাহত রাখে। বাদ না দেয়।'

আমিও আল্লাহর কাছে দুআ করতে থাকি যে, আয় আল্লাহ! তুমি তার মনে সত্য ঢেলে দাও।

কয়েকদিন পর তার তৃতীয় চিঠি আসে। সে লেখে, মাওলানা! আপনি আল্লাহকে হয়ত দলীল-প্রমাণের আলোকে চিনেছেন। কিন্তু আমি আল্লাহকে চোখে দেখে ফেলেছি। গতকালের ঘটনা; আমার স্ত্রী তার ভার্সিটিতে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিল। আমিও তার সাথে ছিলাম। ইউনিভার্সিটির কাজ শেষ করে আমরা যখন ফিরছিলাম, সে গাড়ী ড্রাইভ করছিল। চালাতে চালাতে সে গাড়ী হঠাৎ সাইডে নিয়ে ব্রেক করল। স্টিয়ারিংয়ের উপর মুখ রেখে কাঁদতে আরম্ভ করল। আমি ভাবতে লাগলাম, খোদা না খাস্তা আবার হার্টে সমস্যা হল কি না। হার্টবিট বেড়ে যাওয়ায় হয়ত গাড়ী থামিয়ে দিয়েছে এবং এভাবে কাঁদছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম- কী সমস্যা? কী হল? এতে যেন তার কান্না আরো বেড়ে গেল। হেঁচকি তুলে কাঁদতে লাগল সে। আমি ভড়কে গেলাম। বললাম, আরে বল তো কী হয়েছে? সে কাঁদতে কাঁদতে বহু কষ্টে শুধু এতটুকু বলল- না, আমার কোনো সমস্যা নেই। আমাকে কোথাও নিয়ে তাড়াতাড়ি মুসলমান বানিয়ে নাও। আমি আমার কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না- এ কি সেই মেয়ে, যে আমার সাথে ইসলাম নিয়ে বিতর্ক করত! আর আজ কিনা সেই মেয়েই বলছে- 'আমাকে মুসলমান বানিয়ে নাও'! আমি তড়িৎ গাড়ী ড্রাইভ করে নিকটতম ইসলামিক সেন্টারে তাকে নিয়ে গেলাম। আলহামদু লিল্লাহ, সেখানে সে কালিমা পড়ে মুসলমান হয়েছে।ঘরে ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে গেছে। গত রাত পয়লা রমযানের রাত ছিল। আমরা উভয়ে আজ সাহরী খেয়েছি এবং আজ এই প্রথম দিন, যেদিন আমরা উভয়ে একসাথে রোযা রাখছি।

এ তো ছিল আবদুল লতীফের চিঠি। দ্বিতীয় আরেকটি চিঠি ছিল তার স্ত্রীর। সে তাতে লিখেছে, আমি আপনার শুকরিয়া আদায় করছি। আপনি আমাকে এমন পথের সন্ধান দিয়েছেন, যা আমার সামনে সত্য উদ্ভাসিত করে দিয়েছে। এখন আপনি বলে দিন- আগামীতে আমি কীভাবে চলব?তো যা বলছিলাম, আল্লাহ তাআলার কাছে যদি কিছু চাওয়া হয়, বিশেষ করে যদি হেদায়েত চাওয়া হয় এবং দ্বীনের উপর চলার তাওফীক চাওয়া হয়, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি মোতাবেক যিন্দেগী তলব করা হয়, তাহলে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তা দান করবেন। খোলাসা কথা হল, ব্যস, রাস্তা একটাই। নিজের সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করতে থাকুন এবং চেষ্টার সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার নিকট নেক কাজের এবং ইসলাহের তাওফীক ও মদদ চাইতে থাকুন। তারপর দেখুন, আল্লাহ তাআলা কীভাবে

আপনাকে সাহায্য করেন! কীভাবে তাওফীকে এলাহী আপনার শামিলে হাল হয়! আল্লাহ তাআলা আমল করার তাওফীক দান করুন- আমীন।
৯ (দ্র.ইসলাহী খুতুবাত, ১৮/৭৮-৮৪) (উক্ত তথ্যাবলি মুফতি মুহাম্মাদ তাকী উসমানি হুজুরের লেখা থেকে সংগৃহীত)

নবীজীর আদর্শ ই একমাত্র মুক্তির পথ-একমাত্র সফলতার পথ:

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ঈমান আনার অর্থই হল, তাঁর নীতি ও সুন্নাহকে আমরা নিজেদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করছি। আল্লাহ তাআলা এজন্যই রাসূল প্রেরণ করেছেন যে, আল্লাহর আদেশে তাঁর অনুসরণ করা হবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله

(তরজমা) আমি রাসূল এই উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করেছি যে, আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে তার আনুগত্য করা হবে।-সূরা নিসা (৪) : ৬৪

আল্লাহ তাআলার নিকট বান্দা তখনই মুমিন সাব্যস্ত হয় যখন সে রাসূলকে নিজের সকল বিষয়ের সিদ্ধান্তদাতা (হাকাম) বলে স্বীকার করে এবং তাঁর সকল সিদ্ধান্ত মনেপ্রাণে মেনে নেয়। সকল দ্বিধা ও সংশয় ত্যাগ করে তাঁর ফয়সালার সামনে নিজেকে পুরোপুরি সমর্পিত করে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.

(তরজমা) কিন্তু না, আপনার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসংবাদের বিচারভার আপনার উপর অর্পণ না করে; অতপর আপনার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাদের মনে কোনো দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়।-সূরা নিসা (৪) : ৬৫

মুমিনকে আল্লাহ তাআলা একটি ব্যবস্থাই দিয়েছেন, যাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে আল্লাহর নিকট কোনো কিছু আশা করার পূর্বশর্ত। আর তা হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদত্ত ব্যবস্থা ও তাঁর পবিত্র জীবনাদর্শ।আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.

(তরজমা) তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।-সূরা আহযাব (৩৩) : ২১
এই উত্তম আদর্শ দ্বারা ঐ জীবনাদর্শই উদ্দেশ্য, যা সূরায়ে জাসিয়ায় এভাবে বলা হয়েছে-.
"এরপর আমি আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দ্বীনের বিশেষ বিধানের উপর। সুতরাং আপনি তা অনুসরণ করুন। অজ্ঞদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না।আল্লাহর মুকাবিলায় তারা আপনার কোনো উপকার করতে পারবে না। যালিমরা একে অপরের বন্ধু আর আল্লাহ তো মুত্তাকীদের বন্ধু।
এই কুরআন মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট দলিল এবং নিশ্চিত বিশ্বাসী জাতির জন্য পথনির্দেশ ও রহমত।-সূরা জাসিয়াহ (৪৫) : ১৮-২০"
কালিমায়ে তাওহীদ ও কালিমায়ে শাহাদতে আমরা এই শরীয়ত ও এই আদর্শকে সত্যতা ও যথার্থতার স্বাক্ষ্য দেই এবং মনেপ্রাণে তা কবুল করার ঘোষণা দান করি। এজন্য আমাদের উপর ফরয, এই আদর্শের আলোকে আমাদের পুরো জীবন, জীবনের প্রতিটি অঙ্গনকে যাচাই করা। অতপর যেখানেই ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা দেখা যায় সংশোধনের চেষ্টা করা। আজ সময়ের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন এই যে, আমরা প্রত্যেকে এবং সমাজের প্রতিটি শ্রেণী নিজের জীবন ও কর্মকে সেই 'উসওয়ায়ে হাসানা'র মাপকাঠিতে যাচাই করব ও নিজেকে সংশোধন করব। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সীরাতের চর্চা সেভাবেই করব যেভাবে সাহাবায়ে কেরাম করতেন।

সুন্নতকে পূরজ্জীবিত করা ও বিদআতকে ঘৃণা করা

সাহাবায়ে কেরাম তালীম-তারবিয়ত, দাওয়াত-তাবলীগ, ওয়ায-নসীহত এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ, এমনকি প্রয়োজনে জিহাদ ও কিতালের মাধ্যমেও নবী-আদর্শের প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন। তাঁরা সব ধরনের চিন্তাগত, বিশ্বাসগত, কর্ম ও প্রথাগত বিদআত এবং সকল প্রকার জাহেলী রীতিনীতিকে পুরোপুরি ঘৃণা করতেন এবং তা নির্মূলের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন। অথচ এসব ক্ষেত্রে আমাদের সাধারণ অবস্থা তো আমাদের সামনেই আছে। এই বিষয়ে যৎসামান্য মেহনত যা হচ্ছে তা পরিমাণ ও গুণগতমান দু'দিক থেকেই আরো অগ্রসর করা অপরিহার্য।

ঈমান ও নির্ভরতা

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সীরাত ও তাঁর উসওয়ায়ে হাসানার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভরতা ছিল সাহাবায়ে কেরামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। তাঁরা তো এই কল্পনাও করতে পারতেন না যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ঈমান আনার পর তাঁর সুন্নাহ ও আদর্শের কোনো একটি ক্ষুদ্র বিষয়েও সামান্য সংশয়-সন্দেহ হতে পারে! তদ্রূপ এ বিষয়টিও তাদের সমাজে সম্ভব ছিল না যে, বিশ্বাস হবে রিসালতের প্রতি আর শিক্ষা ও সংস্কৃতি এবং সভ্যতা ও জীবনযাপন পদ্ধতি হবে অন্য জাতির!

আজ আমাদের বড় দুর্ভাগ্য এই যে, আমাদের জীবন সংশয় ও স্ববিরোধিতায় পূর্ণ। আমাদের ঈমান মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর অথচ আমাদের জীবনাদর্শ হচ্ছে পশ্চিমা সভ্যতা। সুন্নতে নববীর পরিবর্তে পশ্চিমা সংস্কৃতি আমাদের কাছে অনুকরণীয়। বেশভূষায় আমরা আল্লাহর রাসূলের অনুসারী নই, পশ্চিমাদের অনুসারী। মসজিদের কিবলা ও মুসল্লিদের চেহারা যদিও বাইতুল্লাহ অভিমুখী, যা হেদায়েত, বরকত ও শান্তি-নিরাপত্তার কেন্দ্র, কিন্তু জীবনের 'কিবলা' হোয়াইট হাউস, যা ভ্রষ্টতা ও বিপথগামিতা এবং জুলুম ও ফাসাদের সর্বনিকৃষ্ট কেন্দ্র।

আমরা যদি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সত্যবাদিতা, তাঁর সুন্নাহর যথার্থতা এবং শুধু ও শুধু তাঁরই জীবনযাপন পদ্ধতি 'উসওয়াহে হাসানাহ' হিসেবে এবং মানবতার শুদ্ধি ও সফলতার একমাত্র উপায় হিসেবে অন্তরের অন্তস্তল থেকে গ্রহণ করতে পারি এবং পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভরতার সাথে এর উপর অটল অবিচল থাকতে পারি, আর মন-মুখ ও চাল-চলনে একথা প্রমাণ করতে পারি যে-

رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحد صلى الله عليه وسلم نبيا.

(আমি আল্লাহকে রব হিসেবে পেয়ে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পেয়ে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট) তাহলেই আমরা মুক্তি পাব।

নিজ সন্তান, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের জন্য তা-ই পছন্দ করা

সাহাবায়ে কেরামের উপরোক্ত গুণাবলির নিশ্চিত ফলাফল এই ছিল যে, তারা নিজেদের সন্তান-সন্ততি, প্রিয়জন ও আত্মীয়-স্বজনের জন্যও আল্লাহর রাসূলের সীরাত ও সুন্নাহকেই পছন্দ করতেন, এরই আলোকে তাঁরা নিজ সন্তানের তরবিয়ত করতেন এবং সন্তানদেরকে এরই উপর প্রতিষ্ঠিত করতেন। আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবকেও এরই দিকে আহবান করতেন এবং তাদেরকে এই পবিত্র জীবনাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাইতেন।

দ্বীনের দাওয়াত পৌছানো-দাওয়াত ইলাল্লাহ

দাওয়াত একটি আরবী শব্দ, যার অর্থ ডাকা, আহবান করা। ইসলামের দাওয়াতের সারকথা হচ্ছে, মানুষকে দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তির দিকে আহবান করা।ইসলামের আবির্ভাব শুধু ব্যক্তির কল্যাণের জন্য নয়; সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য ইসলাম। আর ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের সৌভাগ্য দুটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল : সালাহ ও ইসলাহ। অর্থাৎ নিজে সংশোধন হওয়া এবং অন্যকে সংশোধন করা। দাওয়াতের কাজ ছাড়া যা কখনো সম্ভব নয়।

দাওয়াতি কাজের গুরুত্ব ও ফযীলত এত অধিক, যা কোনো মানুষ বাহ্যিক দৃষ্টিতে অনুধাবন করতে পারে না। পবিত্র কালামের অসংখ্য আয়াত যার উজ্জ্বল সাক্ষী। আল্লাহ তাআলা বলেন, (তরজমা) 'ঐ ব্যক্তির কথার চেয়ে ভালো কথা আর কার হতে পারে, যে আল্লাহর প্রতি আহবান করেছে, সৎ কাজ করেছে এবং বলেছে, আমি অনুগতদের একজন?' (সূরা হামীম আসসাজদাহ : ৩৩)

আল্লামা শাববীর আহমদ উছমানী রাহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখেন, এই আয়াতে ঐ সকল বিশেষ প্রিয়ভাজন বান্দার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যারা একক আল্লাহর প্রভুত্বে বিশ্বাস স্থাপন করে নিজেদের স্থিরতা ও দৃঢ়তার প্রমাণ দিয়েছে। এখানে তাদের অপর একটি উচ্চ মর্যাদার কথা আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ উত্তম ও উৎকৃষ্ট লোক সেই ব্যক্তি যে একমাত্র আল্লাহর জন্য নিজেকে নিবেদিত করে তাঁর আনুগত্য ও নির্দেশ পালনের ঘোষণা দেয়, তাঁর মনোনীত পথে চলে এবং দুনিয়াবাসীকে তাঁর দিকে আসার আহবান জানায়। তার কথা ও কাজ অন্যদেরকে আল্লাহর পথে আসার জন্য প্রভাবিত করে। লোকজনকে সে যে সকল ভালো কাজের দাওয়াত দেয় সে নিজেও সেগুলো আমল করে। আল্লাহর বন্দেগী ও আনুগত্যের ঘোষণা প্রদানে কোন সময়ে কোন স্থানে সামান্যতম সংকোচও বোধ করে না। তার জাতীয় পরিচিতি শুধু ইসলাম। সকল প্রকারের সংকীর্ণতা ও গোষ্ঠীপ্রীতি ত্যাগ করে নিজে খাঁটি মুসলমান হওয়ার ঘোষণা প্রদান করে এবং যার দাওয়াত দেওয়ার জন্য সাইয়েদুনা মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দন্ডায়মান হয়েছিলেন এবং যার জন্য সাহাবায়ে কিরাম রা. নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন।

সূরা নাহল-এ আল্লাহ তাআলা বলেন, (তরজমা) 'ডাক স্বীয় প্রতিপালকের পথে পরিপক্ক কথা বুঝিয়ে এবং উত্তমরূপে উপদেশ শুনিয়ে। আর তাদেরকে বিতর্কে নিরুত্তর কর উত্তম পন্থায়।'

এই আয়াতে খোদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তালীম দেওয়া হচ্ছে মানুষকে কিভাবে পথে আনতে হবে। এর তিনটি পন্থা বলা হয়েছে। ক) হিকমত, খ) মাওইযা হাসানা ও গ) জিদাল বিল্লাতী হিয়া আহসান।

হিকমত অর্থাৎ মযবূত দলিল-প্রমাণের আলোকে হিকমত ও প্রজ্ঞাজনোচিত ভঙ্গিতে অত্যন্ত পরিপক্ক ও অকাট্য বিষয়বস্তু পেশ করতে হবে, যা শুনে সমঝদার ও জ্ঞানবান রুচিসম্পন্ন লোক মাথা ঝুঁকিয়ে দিতে বাধ্য হয়। দুনিয়ার কাল্পনিক দর্শনাদি তার সামনে ম্লান হয়ে যায়। কোনো রকম জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তা-চেতনার বিকাশ যেন ওহী বর্ণিত তত্ত্ব ও তথ্যকে পরিবর্তন করতে না পারে।

মাওইযা হাসানা-এর দ্বারা মনোজ্ঞ ও হৃদয়গ্রাহী উপদেশকে বোঝানো হয়েছে, যা কোমল চরিত্র ও দরদী আত্মার রস ও আবেগে থাকবে পূর্ণ। নিষ্ঠা, সহমর্মিতা, দরদ ও মধুর চরিত্র দিয়ে সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণ পন্থায় যে নসীহত করা হয় তাতে অনেক সময় পাষাণ-হৃদয়ও মোম হয়ে যায়, মৃত দেহে প্রাণ সঞ্চার হয় এবং একটি হতাশ ও ক্ষয়ে যাওয়া জাতি গা ঝাড়া দিয়ে জেগে ওঠে। মানুষ ভয়-ভীতি ও আশাব্যঞ্জক বক্তব্য শুনে লক্ষ্যস্থলের দিকে ছুটে চলে প্রবল বেগে, বিশেষত যারা অতটা সমঝদার, ধীমান ও উচ্চ মেধা-মস্তিষ্কের অধিকারী নয়, অথচ অন্তরে সত্য-সন্ধানের স্পৃহা প্রবল, তাদের হৃদয়ে মনোজ্ঞ ওয়ায-নসীহত দ্বারা এমন কর্ম-প্রেরণা সঞ্চার করা যায়, যা উঁচু জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দ্বারা সম্ভব হয় না।

হ্যাঁ, দুনিয়ায় সব সময় একটা দল এমনও থাকে, যাদের কাজই হচ্ছে প্রতিটি বিষয়ে জটিলতা সৃষ্টি করা এবং কথায় কথায় হুজ্জত করা ও কূটতর্কে লিপ্ত হওয়া। এরা না হিকমতপূর্ণ কথা কবুল করে, না ওয়ায-নসীহতে কান দেয়। তারা চায় প্রতিটি বিষয়ে তর্ক-বিতর্কের ময়দান উত্তপ্ত হোক। অনেক সময় প্রকৃত বোদ্ধা, ন্যায়নিষ্ঠ ও সত্যানুসন্ধিৎসু স্তরের লোকদেরও সংশয়-সন্দেহ ঘিরে ধরে, আলোচনা-পর্যালোচনা ছাড়া তখন তাদেরও সন্তোষ লাভ হয় না। তাই বলা হয়েছে-'আর তাদেরকে বিতর্কে নিরুত্তর কর উত্তম পন্থায়।' অর্থাৎ কখনো এমন অবস্থার সম্মুখীন হলে তখন উৎকৃষ্ট পন্থায় সৌজন্য ও শিষ্টাচার এবং সত্যানুরাগ ও ন্যায়-নিষ্ঠতার সাথে তর্ক-বিতর্ক কর। প্রতিপক্ষকে নিরুত্তর করতে চাইলে তা উত্তম পন্থায় কর। অহেতুক বেদনাদায়ক ও কলজে-জ্বালানো কথাবার্তা বলো না, যা দিয়ে সমস্যার কোনো সুরাহা হয় না; বরং তা আরও প্রলম্বিত হয়। উদ্দেশ্য হওয়া উচিত প্রতিপক্ষকে বুঝিয়ে সন্তুষ্ট করা ও সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। রুক্ষতা, দুর্ব্যবহার, বাক-চাতুর্য ও হঠকারিতা কখনো সুফল দেয় না। (তাফসীরে উছমানী ২/৬২৮-৬২৯)

অন্য জায়গায় আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-(তরজমা) মহাকালের শপথ! নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা নহে, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্য্যের উপদেশ দেয়।' (সূরা আসর)

অর্থাৎ ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষের চারটি জিনিস প্রয়োজন : ক) আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনা এবং তাদের হিদায়াত ও প্রতিশ্রুতির প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা-তা দুনিয়া সম্পর্কিত হোক, কিংবা আখিরাত সম্পর্কিত। খ) সেই ঈমান ও ইয়াকীনের প্রভাব কেবল মন-মানস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ না রাখা; বরং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও তা প্রকাশ করা এবং বাস্তব জীবনে আন্তরিক বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটানো। গ) কেবল নিজের ব্যক্তিগত সংস্কার ও কল্যাণ নিয়েই তুষ্ট না থাকা, বরং দেশ ও জাতির সামষ্টিক স্বার্থকেও সম্মুখে রাখা। দুজন মুসলমান একত্র হলে নিজের কথা এবং কাজের দ্বারা একে অপরকে সত্য দ্বীন মেনে চলার এবং প্রতিটি কাজে সত্য ও সততা অবলম্বনের তাকীদ করা। ও ঘ) প্রত্যেকে একে অপরকে এই নসীহত ও ওসীয়ত করা যে, সত্য ও ন্যায়ের ক্ষেত্রে এবং ব্যক্তিগত ও জাতীয় সংস্কার-সংশোধনের ক্ষেত্রে যত বাধা-বিপত্তি, যত অসুবিধা ও বিপদাপদ দেখা দিবে, এমনকি যদি মন-মানসের বিরোধী কাজও বরদাশত করতে হয় তাহলেও ধৈর্য্য ও সবরের সঙ্গে তা বরদাশত করতে হবে। পুণ্য ও কল্যাণের পথ থেকে পা যেন কখনো ফসকে না যায় এই ওসীয়ত করতে হবে। যে সৌভাগ্যবান ব্যক্তির মধ্যে এই চারটি গুণের সমাবেশ ঘটবে এবং যিনি নিজে পূর্ণাঙ্গ হয়ে অন্যদেরকে পূর্ণাঙ্গ করার চেষ্টা চালাবেন, কালের পৃষ্ঠায় তিনি অমর হয়ে থাকবেন। আর এমন ব্যক্তি যেসব নিদর্শন রেখে দুনিয়া থেকে বিদায় নেবেন তা 'বাকিয়াতে সালেহাত' তথা অবশিষ্ট নেক কাজ হিসেবে সর্বদা তার নেকীর খাতায় সংযোজন ঘটাবে। বস্তুত এই ছোট সূরাটি সমস্ত দ্বীন ও হিকমতের সার-সংক্ষেপ। ইমাম শাফেয়ী রাহ. যথার্থ বলেছেন যে, কুরআন মজীদে কেবল যদি এই সূরাটিই নাযিল করা হতো, তাহলে (সমঝদার) বান্দাদের হিদায়াতের জন্য যথেষ্ট ছিল। পূর্বকালের মনীষীদের মধ্যে দুজন একত্র হলে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় তারা একে অপরকে সূরাটি পাঠ করে শুনাতেন। (তাফসীরে উছমানী ৪/৭৪৫)

(উপরোক্ত তথ্যাবলি মাসিক আলকাউসার পত্রিকা থেকে সংগৃহীত)

বিপদে ধৈর্য্য ধারণ

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ.

তিনিই সেই সত্তা, যিনি জীবন-মৃত্যুকে এ পরীক্ষা করার জন্য সৃষ্টি করেছেন যে, তোমাদের মধ্যে কে অধিক উত্তম আমল করে। আর তিনিই পরাক্রমশালী ও অধিক ক্ষমাশীল। সূরা মুলক (৬৭) : ২

আল্লাহ তাআলা মানুষের এ পরীক্ষা নেওয়ার জন্য সৃষ্টি করেছেন পৃথিবী। মানুষ পৃথিবীতে এসে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নানা রকম পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে থাকে। মানুষের প্রবৃত্তি তার জন্য এক পরীক্ষার বস্তু। এই প্রবৃত্তি-পূজা থেকে বেরিয়ে নিজেকে সঠিক পথের দিশারী বানানোÑ আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশাল এক পরীক্ষা। অনুরূপ মানুষ ও জিনদের মধ্যে যারা সদা অন্যায়ের পথে ডাকছেÑ তারা সঠিক পথের অনুসন্ধিৎসুদের জন্য বড় পরীক্ষা। তাদের ডাকে সাড়া না দিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দেওয়াÑ মুমিনের জন্য এক অগ্নিপরীক্ষা। তাছাড়া পার্থিব বিপদাপদ ও কষ্টক্লেশের মাধ্যমেও আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা করে থাকেন। একজন মুমিনকে তার জীবনে এসব পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা করতে চানÑ কে সবচে উত্তম আমলকারী আর কে নয়। এ পৃথিবীতে শুধু সাধারণ মানুষ নয়, বরং আল্লাহ তাআলার সবচে প্রিয় বান্দাগণও এ পৃথিবীতে কঠিন কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছেন। তবে তারা ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে আল্লাহ তাআলার মনোনীত ও সবচে প্রিয় বান্দারূপে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। অনুরূপ যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ ছাড়াও আল্লাহ তাআলার বিশেষ বান্দাগণও বিপদের মুখে পড়ে ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। তাঁরা আল্লাহ তাআলার মনোনীত ও বিশেষ বান্দা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। উক্ত সফলতা ও সৌভাগ্য অর্জনের ক্ষেত্রে ধৈর্যের রয়েছে অসাধারণ প্রভাব। এজন্য কুরআন মাজীদ মানুষকে সবর অবলম্বন করার প্রতি উৎসাহ দিয়েছে। নানাভাবে মানুষকে ধৈর্যের চর্চা করার আহ্বান জানিয়েছে। এবং এর বহুবিধ উপকারিতা ও ফায়দার কথা তুলে ধরেছে।

কুরআন মাজীদে صبر শব্দটি বিভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এর মূল অর্থ হল, নিজেকে সংকট, অপছন্দনীয় অবস্থা ও পরিস্থিতিতে সুনিয়ন্ত্রিত রাখা, হক ও নীতির ওপর অটল অবিচল রাখা। যদিও সবজায়গায় আভিধানিক অর্থের প্রভাব রয়েছে।বিপদাপদে নিজেকে স্থির রাখা ও আল্লাহ তাআলার ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা।

আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব (কখনো) কিছুটা ভয়-ভীতি দ্বারা, (কখনো) ক্ষুধা দ্বারা এবং (কখনো) জান-মাল ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা। সুসংবাদ শোনাও

তাদেরকে, যারা (এরূপ অবস্থায়) সবরের পরিচয় দেয়। যারা তাদের কোনো মুসিবত দেখা দিলে বলে ওঠে, আমরা সকলে আল্লাহরই এবং আমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। সূরা বাকারা (২) : ১৫৫-১৫৬

প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে গিয়ে গোনাহ ও অন্যায় থেকে নিজেকে দূরে রাখা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান, তাঁর ইবাদাত-বন্দেগী ও দ্বীনের যাবতীয় বিধি-বিধান পালনে সদা তৎপর থাকা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেনÑ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَ صَابِرُوْا وَ رَابِطُوْا وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

হে মুুমিনগণ! সবর অবলম্বন কর, মোকাবেলার সময় অবিচলতা প্রদর্শন কর এবং সীমান্ত রক্ষায় স্থিত থাক। আর আল্লাহকে ভয় করে চল, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। সূরা আলে ইমরান (৩) : ২০০

পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ.

হে মুমিনগণ! তোমরা সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও, নিশ্চয় আল্লাহ সবরকারীদের সঙ্গে রয়েছেন। -সূরা বাকারা (২) : ১৫৩

মুমিন বান্দা বিপদের মুখোমুখি হতে পারে দ্বীনের কথা প্রচার করতে গিয়ে, নিজের আদর্শ ও লক্ষ্যের ওপর টিকে থাকার সংগ্রামে। দ্বীনের পথে চলতে গিয়ে, দ্বীনের কথা বলতে গিয়ে কেউ যদি বিপদে পড়ে আর সবর করে, তখন আল্লাহ পাক তাকে পুরস্কৃত করবেন- এ তো স্বাভাবিক কথা। কিন্তু আমাদের জন্যে আশার কথা হলো, দ্বীনের সঙ্গে সামান্য সম্পর্কও নেই এমন ব্যক্তিগত কিংবা পার্থিব বিষয়েও যদি আমরা বিপদাক্রান্ত হয়ে সবরের পরিচয় দিই, তখনো আমাদের জন্যে রয়েছে দয়াময়ের পক্ষ থেকে পুরস্কারের ঘোষণা। হাত থেকে পড়ে কাচের দামি গ্লাসটা ভেঙে গেল, কিংবা বন্যার পানিতে মাঠভরা পাকা ধান তলিয়ে গেল, রাতের অন্ধকারে চোর হাতিয়ে নিয়ে গেল অর্থকড়ি- এমন বিপদে পড়েও যারা ‘ইন্না লিল্লাহ’ পড়ে, আল্লাহর সিদ্ধান্তকে মেনে নেয়, তাদের কথা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এভাবে-

اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ.

তাদের ওপরই রয়েছে তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে শান্তি ও অনুগ্রহ, আর তারাই কেবল সঠিক পথপ্রাপ্ত। -সূরা বাকারা (২) : ১৫৭

ধৈর্য ধারণকারীদের বিপদ থেকে উদ্ধারের ঘোষণা

যারা ধৈর্য ধারণ করে, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। জটিল থেকে জটিল অবস্থায় সহজ পথ দেখান। এবং জীবনের নানা ধাপে তাদেরকে সফলতা দান করেন। তিনি ইরশাদ করেন

الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ، اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ.

যারা তাদের কোনো মুসিবত দেখা দিলে বলে ওঠে, আমরা সকলে আল্লাহরই জন্য এবং আমাদেরকে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে। এরাই তারা, যাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে বিশেষ করুণা ও দয়া রয়েছে এবং এরাই আছে হেদায়েতের ওপর। সূরা বাকারা (২) : ১৫৬-১৫৭

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে ধৈর্য ধারণকারীদেরকে বিভিন্ন প্রতিদানের কথা শুনিয়েছেন,

“এবং তারা সেইসকল লোক, যারা নিজ প্রতিপালকের সন্তুষ্টিবিধানের উদ্দেশ্যে সবর অবলম্বন করেছে, নামায কায়েম করেছে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং তারা দুর্ব্যবহারকে প্রতিরোধ করে সদ্ব্যবহার দ্বারা। প্রকৃত নিবাসে উৎকৃষ্ট পরিণাম তাদেরই জন্য। (অর্থাৎ) স্থায়ীভাবে অবস্থানের সেই উদ্যানসমূহ, যার ভেতর তারা নিজেরাও প্রবেশ করবে এবং তাদের বাপ-দাদাগণ, স্ত্রীগণ ও সন্তানদের মধ্যে যারা নেককার হবে তারাও। আর (তাদের অভ্যর্থনার জন্য) ফেরেশতাগণ তাদের নিকট প্রত্যেক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। (আর বলতে থাকবেÑ) তোমরা (দুনিয়ায়) যে সবর অবলম্বন করেছিলে তার বদৌলতে এখন তোমাদের প্রতি কেবল শান্তিই বর্ষিত হবে এবং (তোমাদের) প্রকৃত নিবাসে এটা কতইনা উৎকৃষ্ট পরিণাম। সূরা রা‘দ (১৩) : ২২-২৫”

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য কুরবান হওয়া:

একজন মানুষ দুনিয়াতে আসে তার রবের করুণায়। রব তাকে সারাটিজীবন আগলে রাখে। এই জীবন শুধু আল্লাহ তাআলার জন্য এই জীবন শুধুমাত্র আল্লাহ ও তার রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। নিজের চাওয়া পাওয়া সব কিছুর উর্ধ্বে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পছন্দকে প্রাধান্য দেওয়া একজন মুমিনের প্রধান বৈশিষ্ট্য।নিজের নফসের বিরুদ্ধে গিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সকল সৎ আমল সম্পাদন করা। হযরত ইব্রাহিম

আলাইহিস সালাম যেমন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর উপদেশ মেনে তার কলিজার টুকরো সন্তানকে আল্লাহর নামে কুরবানী করতে পিছুপা হননি তেমনি ভাবে তার ছোট্ট ছেলে ইসমাইল আলাইহিস সালাম নিজে কুরবানী হতে সামান্য পিছুপা হননি,সুবহানাল্লাহ!ঠিক তেমনিভাবে আমাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে সাজাতে হবে,আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দ্বীনের জন্য নিজের সবকিছু তুচ্ছ করে,কুরবান করে আল্লাহর রাস্তায় নিজেকে সমর্পণ করতে হবে, ইনশাআল্লাহ। এই পথ ই মহাসফলতার পথ,এই পথ ই জান্নাতের পথ!
যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সন্তুষ্টি করতে পারল না,যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য কুরবান হতে পারল না সেই তো চরম ব্যর্থ।ইন্নালিল্লাহ! হে আল্লাহ চূড়ান্ত ব্যর্থতা থেকে আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন আমীন।

কুরআনের আয়াতে আয়াতে সফলতা ও ব্যার্থতা:

“অবশ্যই যে সব লোক আমার সাক্ষাৎ লাভের আশা রাখে না এবং পার্থিব জীবন নিয়েই উৎফুল্ল রয়েছে, তাতেই প্রশান্তি অনুভব করছে এবং যারা আমার নিদর্শন সমূহ সম্পর্কে বেখবর। এমন লোকদের ঠিকানা হল আগুন বদলা হিসাবে যা তারা অর্জন করছিল।
অবশ্য যেসব লোক ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে তাদেরকে হেদায়েত দান করবেন তাদের পালনকর্তা,তাদের ইমানের মাধ্যমে। এমন সুসময় কানন কুঞ্জের প্রতি যার তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রসবনসমূহ। সেখানে তাদের প্রার্থনা হল ‘পবিত্র তোমার সত্তা হে আল্লাহ। আর শুভেচ্ছা হল সালাম আর তাদের প্রার্থনার সমাপ্তি হয়, সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহর জন্য বলে। সূরা ইউনুস :৭-১০”

“যারা পরকালের চাইতে পার্থিব জীবনকে পছন্দ করে,আল্লাহর পথে বাধা দান করে এবং তাতে বক্রতা অন্বেষণ করে,তারা পথ ভুলে দূরে পড়ে আছে। সূরা ইব্রাহীম:৩”

সুন্নাতে ভরা জীবন:

আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে,সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে মুহাম্মাদের প্রতি অবতীর্ণ সত্যে বিশ্বাস করে,আল্লাহ তাদের মন্দ কর্ম সমূহ মার্জনা করেন এবং তাদের অবস্থা ভালো করে দেন। (সূরা মুহাম্মদ:২)

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের বান্দা তার জীবনকে সাজাবে। যতদিন পর্যন্ত বান্দা কোরআন ও হাদিসকে আঁকড়ে ধরবে বান্দা পথ ভ্রষ্ট হবে না। সুন্নাতসমূহের অনুসরণের মাঝেই আছে দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্য ও কল্যাণ। নিচে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দৈনন্দিন কয়েকটি সুন্নাতসমূহ তুলে ধরা হলো :

★সকল কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ ও শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলা।

★বসে খাবার ও পানাহার করা।

★ বেশি বেশি সালামের আদান-প্রদান।

★মিসওয়াক করা,মিসওয়াকের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন।

★রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আতর বা সুগন্ধি খুব পছন্দ করতেন,গায়ে মাখতেন।

★বাহিরে যাওয়ার সময় বাম পা দিয়ে ঘর থেকে বের হওয়া ও ঘরে প্রবেশ করার সময় ডান পা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করা।

★বাথরুমে প্রবেশের সময় বাম পা দিয়ে প্রবেশ করা ও বাথরুমের দোয়া পড়া।

★মহান আল্লাহর জিকির পাঠ করা,তাসবিহ পাঠ করা।

★সব সময় আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করা আলহামদুলিল্লাহ। প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য অগণিত সুন্নত রয়েছে।সকল সুন্নত কে মনেপ্রাণে ভালোবাসা এবং সেগুলো পালনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা, ইনশাআল্লাহ

উপসংহার:

“যে নিজেকে শুদ্ধ করে সেই সফলকাম এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়”।

মুমিনের দিল সব সময় উতলা থাকে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির পথ হাসিল করার জন্য। প্রিয় নবীজির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উত্তম উম্মাত হওয়ার জন্য! একজন মুমিন বান্দা সবসময় আত্মসংশোধনের জন্য সচেষ্ট থাকে। কোথায় নিজের ভুল,কোথায় নিজের ভ্রান্তি সেগুলো খুঁজে খুঁজে বের করার চেষ্টা করে, সেগুলো থেকে নিজেকে দূরে রাখার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বলে, হে আল্লাহ আপনি আমাকে সকল প্রকার গুনাহের পথ থেকে হেফাজত করুন আমীন।

হয়তো আবারো ভুল হয়ে যায়, বান্দা আবারও কেঁদে কেঁদে আল্লাহকে ডাকে বলে,আস্তাগফিরুল্লাহ। হাজারো গুনাহের পর বান্দা ফিরে আসে তার রবের নিকট এবং বলে হে আল্লাহ আপনি আমাকে মাফ করে দিন নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল ও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

“মুমিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে”(সূরা:আল মুমিনূন ১)

আলহামদুলিল্লাহ, মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘মুমিনগণ সফল হয়ে গেছে’ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি আদায়,এটাই মহাসফলতা। মহান আল্লাহ নিশ্চয়ই তার মুমিন বান্দাকে ক্ষমা করে দেন ও নিজ দয়ায় তার বান্দা-বান্দীকে জান্নাত দান করুন আমীন।

যারা পরকালের চাইতে পার্থিব জীবনকে পছন্দ করে; আল্লাহর পথে বাধা দান করে এবং তাতে বক্রতা অন্বেষণ করে তারা পথ ভুলে দূরে ভরে আছে। (সূরা ইব্রাহীম:৩)

যে নিজেকে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ থেকে দূরে রাখল সে কতই না হতভাগা,নাউজুবিল্লাহ! যে নিজেকে প্রিয় নবীজির সুন্নত থেকে দূরে রাখল সে কতই না অন্ধকারে পতিত হলো!বলতে অনেক কষ্ট হয় যে লক্ষ কোটি বান্দার হৃদয়ে কি আকাঙ্ক্ষা থাকে?থাকে কি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য কুরবান হওয়ার আকাঙ্ক্ষা? যার হৃদয়ে থাকে আল্লাহ ও তার রাসূলের জন্য ভালোবাসা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য কুরবান হওয়ার আকাঙ্ক্ষা,সে মহাসফলতা অর্জন করলো, সুবাহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি।

আর সেই নরাধম কতই না হতভাগা আল্লাহর মুহাব্বাত কে বুঝতে পারল না, প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পথকে চিনতে পারল না,এইতো জীবনের চূড়ান্ত ব্যর্থতা!

হে মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এই ব্যর্থতা থেকে হেফাজত করুন। আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা দান করুন, জাহান্নাম থেকে বাঁচান ইয়া রব্বী,আমাদেরকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন!আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন।